ফজলুল বারী

প্রজন্মের পরিভ্রমন

পায়ে হেঁটে বাংলাদেশ ভ্রমনের শেষ পর্ব শুরু করা হয় ১৯৮৬ সালে। প্রথম পর্বের পর্যটক আনাড়ি। অভিজ্ঞতার অভাবে বৃহত্তর চট্টগ্রাম, পাবর্ত্য চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধের তথ্য সংগ্রহে জোর দেয়া যায়নি। দ্বিতীয় পর্বে তুলনামূলক আত্মবিশ্বাসী অভিজ্ঞতায় এক প্রস্থ প্রশ্নমালা তৈরি করে মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় ইতিহাস সংগ্রহ প্রবনতায় পাওয়া গেছে নানান ফলাফল। পথে বিশ্রামের জন্যে সবচেয়ে ভালো জায়গা ছিল স্থানীয় স্কুল বা কলেজ। অথবা একটি শহরে সন্ধ্যার আগে পৌছানো গেলে প্রথম খুঁজে বের করা হয়েছে প্রেসক্লাব এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অফিস। বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলা শহরে এখন এ দুটি প্রতিষ্ঠানের অফিস, সাইনবোর্ড দৃশ্যমান। এমন জায়গাগুলোতে পৌছে গেলে ইন্টারভ্যু, তথ্য সংগ্রহের জন্যে একাত্তরের অকুতোভয় সৈনিক মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকাটি পাওয়া যেত সহজে। রথ দেখা কলা বেচার মতো ওই সময়ে জুটে যেত রাত কাটানোর মতো একটি আশ্রয়ের জায়গা। জাতিগত ভাবে বাঙ্গালি অতিথি পরায়ন। ভ্রমন পছন্দ করেন সবাই। অনেকে সময় বা সামর্থ্যের অভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। বয়সটা তখন টগবগে তারুণ্যের। হালকা ছিপছিপে গড়নের হলেও দেখতেও মন্দ না। এ কথা সে কথায় রাঙ্গিয়ে দেয়া যেত মানুষের মন। অতিথি পরায়ন বাঙ্গালি মন তখন ব্যস্ত কোথায় রাখবে কি খাওয়াবে! এভাবে থাকা-খাওয়ার দুশ্চিন্তা হয় উধাও।

আর রাজনীতিক মুক্তিযোদ্ধার বাড়িতে থাকার সুযোগ হলে লম্বা সময় পাওয়া যেত ইন্টারভ্যুর। নিজের মন থেকে তৈরি করা প্রশ্নগুলো ছিল মোটামুটি এ রকমঃ একাত্তরের বয়স, পেশা, মার্চের দিনগুলোর কিছু বর্ণনা, ওই এলাকায় কে কোথায় প্রথম তুলেছিল স্বাধীনতার পতাকা, যুদ্ধ প্রস্তুতির প্রশিক্ষন কোথায় কার নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল, হানাদার বাহিনীর পৌছানোর দিনের ঘটনা, কিভাবে দেশ ছাড়লেন, ভারতে গিয়ে উঠলেন কোথায়, কোন ক্যাম্পে কার নেতৃত্বে প্রশিক্ষন চলল, প্রথম দিনের যুদ্ধ বর্ণনা, স্মরণীয় কিছু যুদ্ধের স্মৃতি, বিজয়ের দিনের প্রতিক্রিয়া, এলাকার স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকার যুদ্ধাপরাধীদের তালিকা, যুদ্ধ বিজয় শেষে দেশে আসার পরবর্তী দিনগুলোর কথা, আজকের বাংলাদেশ যেমন চলছে এ ব্যাপারে তার আজকের প্রতিক্রিয়া, ইত্যাদি। পরবর্তীতে কলকাতা ও আগরতলায় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অনুসন্ধানে কাজ দিয়েছে প্রজন্মের পরিভ্রমনের উপাত্তশালা। কলকাতাকে যদি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক-কূটনৈতিক রাজধানী বলা যায়, সামরিক রাজধানীটি ছিল আগরতলা। ফুটনোটঃ প্রজন্মের পরিভ্রমন শিরোনামটি বিচিন্তা সম্পাদক মিনার মাহমুদের।

দুই.

মুক্তিযোদ্ধাদের বেশিরভাগের একাত্তরের বয়স ছিল আঠার থেকে পঁচিশের মধ্যে। আঠারর কম বয়সী মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যাটিও কম ছিল না। অনেকেই তখন কলেজে পা দিয়েছেন বা পাশ করেছেন ইন্টার-ডিগ্রি। স্কুলের গন্ডি পেরোননি বা পেরোতে পারেননি এমন অনেকেই বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে যান যুদ্ধে। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাথমিক পরিচিতি খুঁজতে গিয়ে অবাক হয়ে জানতে হয় তাদের বেশিরভাগ বাড়ি থেকে পালানো ছেলে। এবং বেশিরভাগ কৃষক পরিবারের সন্তান। কোন কিছু পাবার মোহে নয় দেশ মাতৃকার স্বাধীনতার টানে অজানার পথে পা বাড়িয়ে খুব সাধারন সাদামাটা প্রশিক্ষন নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন শত্রুর বিরুদ্ধে। মূলত এমন ঘর পালানো ছেলেদের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন একটি দেশ। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর মূলত শিক্ষিত মুক্তিযোদ্ধারাই নানান সুযোগ সুবিধা বুঝে নিয়েছেন। শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত নিরক্ষর গ্রামের ছেলে এসব মুক্তিযোদ্ধারা হয়ে পড়েছেন অসহায়। এদের অনেকের পরিচিতি এখন দুঃস্থ মুক্তিযোদ্ধা (!)। জীবন কষ্টে চলে সরকারি ভাতার সামান্য টাকায়।

নারী মুক্তিযোদ্ধাদের বেশিরভাগ ছিলেন শিক্ষিত পরিবারের সন্তান। অনেকে পেশায় ছিলেন চিকিৎসক, শিক্ষক বা সাংস্কৃতিক কর্মী। ত্রিপুরার আগরতলার মতো সীমান্ত লাগোয়া এলাকায় যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জরুরি চিকিৎসা অস্ত্রোপচারের উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত হাসপাতাল পরিচালনা কাজে এরা জড়িত ছিলেন। এমন ত্রিপুরার মেলাগড় হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় নেতৃত্বের ভূমিকা ছিল গণস্বাস্থ্যের ডা. জাফরউল্লাহ খানের। করিমন বিবির মতো অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছেন এমন গ্রামের মহিলার সংখ্যা খুব বেশি না হলেও মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়, খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন এমন গ্রামীণ নারীর সংখ্যা অগনিত।

একাত্তরের বাংলাদেশের যে এলাকায় কলেজ ছিল সে এলাকার প্রতিরোধ, স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি ছিল বেশি। এর থেকে মার্চের আন্দোলনের শুরু থেকে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে ছাত্র আন্দোলনের শক্তিশালী প্রভাবের প্রমান মেলে। যেখানে কলেজ ছিল না সেখানে প্রতিরোধ সংগ্রামে নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিলেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, ন্যাপ, নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি, ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মী বা হাইস্কুলের শিক্ষক, নবম-দশম শ্রেনীর ছাত্রছাত্রীরা । মার্চের ২ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক বটতলায় ডাকসুর উদ্যোগে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের পর পর সারাদেশ জুড়ে উত্তোলন শুরু হয় স্বাধীনতার পতাকার। ৭ মার্চ রমনার রেসকোর্সে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম', ঘোষনার পর সারাদেশে সৃষ্টি হয় স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন প্রশিক্ষনের জোয়ার । কোথাও কোন বাড়িতে বা দোকানে পতাকা নেই সেটিই ছিল খবর।

শুরুতে এলাকায় এলাকায় বাঁশের লাঠি হাতে শুরু হয় প্রতিরোধ প্রশিক্ষন। তৎকালীন ওই বাহিনীর নাম ছিল জয় বাংলা বাহিনী। এলাকার অবসরপ্রাপ্ত তৎকালীন ইপিআরের সদস্য বা ছুটিতে আসা ইপিআর সেনা সদস্য, পুলিশ, আনসার বাহিনীর সদস্যরা এসব জয় বাংলা বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষন পরিচালনায় নেতৃত্ব দেন। কোন কোন এলাকার জেলা প্রশাসক, পুলিশ প্রশাসকের পক্ষে এসব প্রশিক্ষনে সহায়তা, সরকারি অস্ত্রাগার খুলে তাদের হাতে অস্ত্রও তুলে দেয়া হয়। এক্ষেত্রে ব্রাক্ষনবাড়িয়ার পৃথক একটি ইতিহাস আছে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ভারতীয় তরফে কতটা সহায়তা পাওয়া যাবে না যাবে তা জানতে সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মনিদের পরামর্শে ফেব্রুয়ারির শেষের দিকেই আগরতলায় যাতায়াত শুরু করেছিলেন সেখানকার তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতা আব্দুল হাই সাচ্চু।

কিন্তু প্রকৃত বাস্তব হচ্ছে পাকিস্তানী হানাদার সেনাবাহিনীর মতো প্রচলিত একটি বাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মতো প্রশিক্ষন বা অস্ত্র কিছুই ওই সময়ে জয় বাংলা বাহিনীর ছিল না। এর কারনে এলাকায় এলাকায় হানাদার বাহিনী পৌছবার পর তাদের শক্তিশালী অস্ত্রশস্ত্রের অবিরাম গুলিবর্ষন, অগ্নি সংযোগের মুখে খুব কম এলাকাতেই প্রতিরোধ দেখানো গেছে। প্রতিরোধ ভেঙ্গে যাবার পর মুক্তিযুদ্ধের নেতাদের প্রায় সবাইকে প্রথমে আত্মগোপন ও পরে ভারতের উদ্দেশে পাড়ি জমাতে হয়। হানাদার বাহিনীর অত্যাচার নির্যাতনের শিকার অথবা আতঙ্কে বিপুল সংখ্যক মানুষ তখন দেশত্যাগ করে শরনার্থী পরিচয়ে হাজির হন ভারতে। বিপদ সংকুল পথ পাড়ি নিয়ে ভারত পর্যন্ত পৌছার পথে পথেও নানান ঘটনা ঘটেছে। খুলনার বটিয়াঘাটা এলাকার কয়েকশ পরিবার যশোরের চুকনগরে পৌছে যখন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন হানাদার বাহিনীর সদস্যরা সেখানে পৌছে গণহত্যা চালায়। এখনও যশোরে প্রতিবছর পালন করা হয় চুকনগর গণহত্যা দিবস। একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি একবার চুকনগর গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী এবং শিকার পরিবারগুলোকে নিয়ে একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করেছিল খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে। অধ্যাপক মুনতাসির মামুনের পরিচালনার সেই ওয়ার্কশপে শতবর্ষী এক বৃদ্ধার ইন্টারভ্যু করার সুযোগ হয়। একাত্তরের স্মৃতি জিজ্ঞেস করলে বিষন্ন বিস্ফোরিত কন্ঠে বলেন, 'জলে গন্ধ হইল, মৎস মরিল, সে কথা ভাবিলে ধড়ে থাকে কি প্রাণ'? চমকে উঠতে হয় তার কথায়। এ যে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা! খুলনায় ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি করেছেন বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বটিয়াঘাটার মানুষের ভাষ জায়গা পেয়েছে বঙ্কিম সাহিত্যে।

তিন.

ভারতে সংগঠিত মুক্তিবাহিনীর প্রধান ছিলেন জেনারেল ওসমানী। কসবা সীমান্তে পৌছে আশ্রয় নেন তৎকালীন ছাত্রলীগ নেত্রী মমতাজ বেগমের বাড়িতে । ভারতে যাবেন কিনা ইতস্তত করছিলেন । জন্ম থেকে পাকিস্তান ভারতের শত্রু রাষ্ট্র। কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তখনও কারো কাছেই স্পষ্ট ছিল না ভারতীয় সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি । ১৯৬৫'র পাক-ভারত যুদ্ধে পাকিস্তানের হয়ে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন ওসমানী। এ কারনে তার সন্দেহ ছিল ভারতীয়রা এখন হাতের নাগালে পেয়ে তাকে গ্রেফতার করতে পারে। জেনারেল ওসমানী তখন আওয়ামী লীগের নির্বাচিত এমএনএ। তাকে সেখানে সাবেক জেনারেল নয় আওয়ামী লীগের এমএনএ পরিচয় দেয়া হবে, এ কথা বলে আশ্বস্ত করে তাকে ভারত যেতে রাজি করানো হয়।

ওসমানীর আগেই অবশ্য সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, ক্যাপ্টেন (অবঃ) মনসুর আলী, কামারুজ্জামান, খন্দকার মোশতাক আহমদ সহ আওয়ামী লীগের নেতারা পৌঁছে যান ভারতে। সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মনি, আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদ, আ স ম আব্দুর রব, শাহাজাহান সিরাজ, রাশেদ খান মেনন, মতিয়া চৌধুরী, হায়দার আকবর খান রনো, হাসানুল হক ইনু, মনিরুল ইসলাম ওরফে মার্শাল মনি সহ প্রধান ছাত্র নেতাদের অনেকে পৌঁছে যান আগরতলায়। সেখানে গিয়ে পৌঁছেন মেজর জিয়াউর রহমান, খালেদ মোশাররফ, শফিউল্লাহ, এ কে খন্দকার, মীর শওকত আলী, অলি আহমদ, সুবিদ আলী ভূঁইয়া সহ বিদ্রোহী আরও অনেক সেনা কর্মকর্তা, সদস্য। পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে যুদ্ধে যোগ দেন কর্নেল তাহের সহ অনেকে। সাংবাদিক, সংস্কৃতি কর্মীদের মধ্যে পৌঁছেন কামাল লোহানী, শাহাদাত চৌধুরী, হারুন হাবীব, কবরী সহ আরও অনেকে।

অনেক পথ হেঁটে আগরতলা পৌঁছে সেখানকার একটি হোটেলে গিয়ে ওঠেন ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত কবরী। ঢালিউডের তৎকালীন হার্টথ্রব নায়িকা। পরনে একটি মাত্র শাড়ি। হোটেল ভাড়া দেবার মতো টাকাও হাতে ছিল না। নায়িকার আগমন সংবাদ শরণার্থী যুবকদের মধ্যে ছড়ালে ভিড় পড়ে যায় হোটেলের চারপাশে। রাস্তার ট্রাফিক সামলাতে ডাকতে হয় পুলিশ। মুসিবত দেখে হোটেলের ম্যানেজার কবরীকে পাঠিয়ে দেন সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্যের বাসায়। পিটিআইর তৎকালীন আগরতলা প্রতিনিধি অনিল ভট্টাচার্যের সেবিকা স্ত্রী গৌরি ভট্টাচার্যের আগরতলার সরকারি বাড়িটি তখন বাংলাদেশের প্রবাসী রাজনৈতিক নেতা, সামরিক কর্মকর্তাদের মিটিং পয়েন্ট হয়ে উঠেছিল। গৌরি ভট্টাচার্য তখন সবার গৌরি বৌদি। নায়িকা অতিথিকে পেয়ে সবার আগে তার স্নান-খাবারের ব্যবস্থা করেন। নিজের ভালো একটি শাড়ি তাকে পরতে দেন। আগরতলা দু'দিন থাকার পর কবরীকে পাঠিয়ে দেয়া হয় কলকাতায়। সেখান থেকে দিল্লী। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারনা চালাতে একটি শিল্পীদলের সঙ্গে তিনি সেখানে কাজ করেছেন। ওই সময়ে কাজ করেছেন মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক একটি ছবিতেও।

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের আগেই প্রাণ বাঁচাতে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকে গেছেন লাখ লাখ শরণার্থী। ত্রিপুরা রাজ্যের জনসংখ্যা তখন ছিল চৌদ্দ লাখ। ষোল লাখ শরণার্থী আশ্রয় নেন শুধু ত্রিপুরা রাজ্যেই। স্কুল-কলেজ, সরকারি আশ্রয় শিবির ছাড়াও ত্রিপুরার এমন কোন বাড়ি তখন শরণার্থী বিহীন ছিল না। প্রথমে শরণার্থীদের ব্যাপারে ভারত সরকারের নির্দেশনা না থাকাতে স্থানে স্থানে তাদের প্রবেশে বাধা দিয়েছে বিএসএফ। কিন্তু মানুষের স্রোতে ওই বাধা টেকেনি। সীমান্ত লাগোয়া শহরগুলোর স্কুল-কলেজে প্রথমে শরণার্থীদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন স্থানীয় রাজনৈতিক সামাজিক নেতাকর্মীরা। এদের আনেকেই জন্মভূমি ছিল বাংলাদেশ তথা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান। সাত চল্লিশের দেশ বিভাগ, পয়ষট্টি সালের যুদ্ধ সহ নানা সময়ে দেশত্যাগ করলেও জন্মভূমির মানুষের বিপদে তারা নিশ্চুপ থাকতে পারেননি। পরবর্তীতে মানবিক কারনে ওই শরণার্থীদের জরুরি আশ্রয় থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে ভারত সরকার।

মুক্তি সংগ্রামে ভারত সরকারের কতটা সহায়তা পাওয়া যাবে না যাবে, এটি যে তখনও স্পষ্ট ছিল না, া আগে লেখা হয়েছে। পাকিস্তানিরা বলে আসছিল তাদের ভাষায় তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধ আসলে পাকিস্তানের অখন্ডতা ধ্বংসে ভারতীয় প্রপাগান্ডা ছাড়া কিছু নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন সহ কয়েকটি দেশ পাকিস্তানের অখন্ডতা অটুট রাখার পক্ষে অবস্থান নেয় । সৃষ্ট আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে শরণার্থীদের আশ্রয়, খাবার-চিকিৎসার দায়িত্ব নিলেও দিল্লীর নেতৃত্ব তখনও বাংলাদেশ পরিস্থিতির সঙ্গে প্রকাশ্যে জড়াতে চাইছিল না। ওই অবস্থায় ব্যারিষ্টার আমির উল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে দিল্লী যান তাজউদ্দিন আহমেদ।

বিষয়টি মিডিয়ার লোকজন জানুক, তাও চাইছিল না ভারত সরকার । নিয়মিত প্যাসেঞ্জার ফ্লাইটে গেলে মিডিয়ার লোকজন জেনে যেতে পারে এ কারনে প্রবাসী দুই নেতাকে একটি মালবাহী বিমানে করে দিল্লী নিয়ে যাওয়া হয়। ওই বৈঠকে ইন্দিরা গান্ধী প্রবাসী নেতাদের তাদের নিজস্ব একটি রাজনৈতিক স্ট্যান্ড নেবার পরামর্শ দেন। এরপরই নেয়া হয় মুজিব নগর সরকার গঠনের উদ্যোগ। একাত্তরের এপ্রিলের দশ তারিখে আগরতলা সার্কিট হাউসে ভারতে আশ্রয় নেয়া আওয়ামী লীগের নির্বাচিত এমএনএ, এমপিএ'দের বৈঠকে প্রবাসী সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। সিদ্ধান্ত হয় প্রবাসী সরকারের শপথ হবে চুয়াডাঙ্গায়। নিরাপত্তার স্বার্থে বৈঠকের সিদ্ধান্তের বিষয়টি মিডিয়ার কাছে গোপন রাখা হয়। তখন পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা মুক্ত এলাকা ছিল। কিন্তু সেখানকার আওয়ামী লীগ নেতা ডা. আসাবুল হক প্রবাসী সরকারের শপথ প্রস্তুতির বিষয়টি একজন বিদেশি সাংবাদিকদের বলে দিলে খবরটি আগাম ফাঁস হয়ে যায়। হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী দখল করে নেয় চুয়াডাঙ্গা। এভাবেই বাংলাদেশের একটি ইতিহাসের অংশ হওয়া থেকে বঞ্চিত হয় চুয়াডাঙ্গা ।

এরপর সিদ্ধান্ত হয় মেহেরপুরের বৈদ্যেরনাথ তলার আম্রকাননে শপথ অনুষ্ঠান হবে । নিরাপত্তা আর কৌশলগত কারনে ওই সিদ্ধান্তটিও গোপন রাখা হয়। শপথের আগের দিন অর্থাৎ ১৬ এপ্রিল বিকালে কলকাতা প্রেসক্লাবে যান ব্যারিষ্টার আমির উল ইসলাম। সাংবাদিকদের বলেন পরেরদিন বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি আছে। সকালে গাড়ি আসবে। সাংবাদিকরা যারা বাংলাদেশ সরকারের অনুষ্ঠানে যেতে চান তারা যাতে সকাল ৬ টার মধ্যে প্রেসক্লাবে থাকেন। উত্তেজনায় অনেক সাংবাদিক রাতে আর বাড়ি যাননি। সকালে তাদের নিয়ে রওয়ানা হয় গাড়ির বহর।

শপথ অনুষ্ঠান প্রস্তুতির দেখভাল করছিলেন চুয়াডাঙ্গা আওয়ামী লীগের নেতা এ্যাডভোকেট ইউনুস আলী সহ আরও অনেকে। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা' গাইবার মতো কাউকে পাওয়া যাচ্ছিল না। খবর পাওয়া গেল সীমান্তের ওপারের কৃষ্ণনগর স্কুলের অষ্টম শ্রেণীতে পড়ুয়া একটি মেয়ে গানটি জানে। আওয়ামী লীগের এক নেতা সেখানে গিয়ে মেয়েটি, তার অভিভাবককে সঙ্গে নিয়ে আসেন। বিদেশি মেহমানদের বসাবার জন্যে চেয়ার সংগ্রহ করা হয় আশেপাশের বাড়ি থেকে। সেই চেয়ারগুলোর অনেকটির একটি হাতল থাকলে আরেকটি ছিল না। কোন কোনটির পা ছিল ভাঙ্গা। বিদেশি সাংবাদিকদের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে সেখানে একটি অভিনয়ের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। সাংবাদিকরা অনুষ্ঠানস্থলে আসার আগে প্রবাসী সরকারের মন্ত্রি পরিষদের সদস্যদের ভারত থেকে এনে স্থানীয় একটি ইপিআর ক্যাম্পে বসিয়ে রাখা হয়। সে কারনে অনুষ্ঠান কভার করতে আসা বিদেশি সাংবাদিকরা দেখেন বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিরা বাংলাদেশের ভিতর থেকে আসছেন। শপথ অনুষ্ঠান শেষে ওই মন্ত্রিরা আবার হেঁটে চলে যান ইপিআর ক্যাম্পে। বিদেশি সাংবাদিকরা দেখেন বাংলাদেশের মন্ত্রিরা আবার চলে যাচ্ছেন বাংলাদেশের ভিতরে। এরপর নিরাপত্তার কথা বলে সাংবাদিকদের সেখান থেকে দ্রুত নিয়ে যাওয়া হয়। তারা চলে যাবার পর প্রবাসী মন্ত্রি পরিষদের সদস্যরাও চলে যান ভারতে। সেদিন কিন্তু এমন না ঘটলে ভিন্ন বিপদ ঘটতে পারত। কারন প্রবাসী সরকারের মন্ত্রীরা মুজিবনগর ছাড়ার আধা ঘন্টার মধ্যে অবশ্য পাকিস্তানি বাহিনী পৌঁছে যায় বৈদ্যেরনাথ তলা অর্থাৎ মুজিবনগরে। সেখানে তারা পৌঁছে শূন্য আম্রকাননে আক্রোশে গুলি ছুঁড়েছে অবিরাম। কিন্তু ততক্ষনে নতুন এক রাষ্ট্রের জন্ম ঘোষনা জেনে গেছে বিশ্ব। বাঙ্গালির বাংলাদেশ।

চার.

শুরুতে শরণার্থী শিবিরগুলো থেকে শুরু হয় মুক্তিযোদ্ধাদের রিক্রুটিং। পরবর্তীতে দেশ থেকে পালিয়ে আসা যুবকের অনেকে সরাসরি যোগ দেন প্রশিক্ষন ক্যাম্পে। বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া বিশেষ বিশেষ এলাকায় চলে প্রশিক্ষন। এমন একটি বিশেষ প্রশিক্ষন ক্যাম্প ছিল মেঘালয়ের তুরায়। পাহাড়ের চূড়ায়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর কমান্ডাররা এসব প্রশিক্ষনের সঙ্গে জড়িত থাকলেও এটিও তখন গোপন রাখা হয়। শুরুতে মুক্তিযোদ্ধাদের পরবর্তীতে মুজিব বাহিনীর রাজনৈতিক মোটিভেশনের কাজ করেন বর্তমান জাসদ নেতা হাসানুল হক ইনু। বাম চিন্তার নেতাকর্মীরা শুরুতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছিলেন মুক্তিবাহিনীতে। মুজিববাহিনীতে প্রবেশাধিকার ছিল শুধুমাত্র আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগ ঘরানার লোকজনের। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এমন মুক্তিবাহিনীর পাশাপাশি মুজিবাহিনী সৃষ্টির বিষয়টি সৃষ্টি করে বিতর্কের। এখন অবশ্য কেউ আলাদা করে মুজিববাহিনীর অন্তর্ভূক্তির বিষয়টি জাহির করেন না।

প্রশিক্ষনের প্রথম কয়েকটি ব্যাচ আগষ্ট পর্যন্ত অপেক্ষায় থেকেছে অস্ত্রের। এ ব্যাপারেও তখন ধীরে চলার নীতি নেয় ভারত সরকার। অস্ত্রের অপেক্ষায় থেকে অনেকের মধ্যে হতাশাও দেখা দেয়। প্রবাসী সরকারের নেতারা অবশ্য পরে এ ব্যাপারে ভারত সরকারকে রাজি করাতে পারেন। বেশিরভাগ মুক্তিযোদ্ধার প্রশিক্ষন ছিল তিন সপ্তাহের। এমন একটি সংক্ষিপ্ত সময়ের প্রশিক্ষন নিয়ে দেশের ভিতর ঢুকে গিয়ে হানাদার বাহিনীর ঘাঁটিতে চোরাগোপ্তা হামলা চালিয়ে দেশের মাটিতে আবার নিরাপদে ফিরে আসার ঘটনা শুরু থেকেই সৃষ্টি করে বিস্ময়ের। প্রতিটি অভিযানের আগে অগ্রবর্তী একটি দল সরেজমিন রেকি করে আসত অকুস্থল। অভিযানে রওয়ানা হবার আগে 'জয় বাংলা' বলে শ্লোগান দিতেন মুক্তিযোদ্ধারা। অপারেশন সফল হবার পর আবার আকাশ কাঁপিয়ে হাঁকিয়ে বলতেন, 'জয় বাংলা'। তথ্য প্রযুক্তির অভাবে অনেক এলাকায় সেমসাইডের ঘটনাও ঘটেছে। যেমন সারারাত ধরে চলেছে যুদ্ধ। গোলাবারুদ ফুরিয়ে গেলে সকালে নতুন গোলাবারুদ নিতে গিয়ে জানা গেছে একদল মুক্তিযোদ্ধা সারারাত ধরে যুদ্ধ করেছেন আরেকদল মুক্তিযোদ্ধার বিরুদ্ধে।

ঝালকাঠির মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসটি কিছুটা ভিন্ন। সেখানকার পেয়ারা বাগান এলাকায় যুদ্ধ করেছে সিরাজ শিকদারের দল। এলাকার লোকজন অবশ্য তাকে হাকিম ইঞ্জিনীয়ার নামে জানতেন। ১৯৬৭-৬৮ সাল থেকে ওই এলাকায় পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলন নামে তার দলের গোপন কার্যক্রম চলে আসছিল। বাংলাদেশের পতাকা নিয়েও সেখানে ভিন্ন একটি ইতিহাস আছে। ১৯৬৮ সালে পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের সম্মেলন উপলক্ষে স্বাধীন পূর্ব বাংলার পতাকা নামের একাধিক পতাকা তোলা হয়। সবুজ জমিনের মধ্যে লাল বৃত্ত সম্বলিত সে পতাকাগুলোর নিচে ঝুলিয়ে রাখা হয় হাতবোমা। পরে পুলিশ এসে পতাকাগুলোকে নামিয়ে উদ্ধারকৃত বোমা সব নিষ্ক্রিয় করে। একাত্তরের মার্চে স্বাধীন বাংলার পতাকা নামে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ যে পতাকাটি তুলে তার সঙ্গে একটি ফারাক ছিল সিরাজ শিকদারের পতাকায়। সোনালী রঙ্গের স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিত্রটি তার পতাকায় ছিল না। তবে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর পতাকা থেকে মানচিত্রটি সরকারি উদ্যোগে বাদ দেয়া হয়। মানচিত্র বাদ দেবার পর ১৯৬৮' তে তোলা সিরাজ শিকদারের পতাকাটিই চলে আসে যা এখনও বাংলাদেশের পতাকা হিসাবে উড়ছে। জাতীয় পতাকার সিরাজ শিকদার সংশ্লিষ্ট ইতিহাসটি ঝালকাঠির মুক্তিযোদ্ধারা জানেন।
চরমপন্থী রাজনীতির কারনে সিরাজ শিকদার ভারতে যাননি । ঝালকাঠির পেয়ারাবাগান এলাকা ছিল তার মূল রণক্ষেত্র। তবে যুদ্ধের নয় মাসই হানাদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং মুক্তিবাহিনী উভয়ের সঙ্গে তাকে যুদ্ধ করতে হয়েছে। সিরাজ শিকদারের ব্যক্তিগত একটি পারিবারিক ঘটনাও আছে ঝালকাঠিতে। তার ছেলে শুভ'র বয়স তখন আট মাস। অনিশ্চিত যুদ্ধ জীবনে এমন ছোট বাচ্চাকে সঙ্গে রাখা সম্ভব ছিল না। দলের এক ক্যাডার কর্মীর ছোটবোনের হাতে শিশু পুত্রের লালনপালনের দায়িত্ব নিয়ে আসেন সিরাজ দম্পতি। দেশ স্বাধীন হবার পর মিসেস শিকদার ঝালকাঠি গিয়ে শুভকে ফেরত নিয়ে আসেন।

পাঁচ.

ব্রম্মপুত্র নদীতে মূলখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন জনপদ কুড়িগ্রামের রৌমারী-রাজিবপুর মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময় ছিল মুক্ত এলাকা। উত্তাল নদী পেরিয়ে সেখানে যেতে কখনো সাহসী হয়নি হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী। মুক্তিযুদ্ধের অনেক স্মৃতি তাই সেই জনপদে। সেক্টর কমান্ডার মেজর জিয়া, কর্নেল তাহের এরা অনেকদিন সেখানে অবস্থান করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের অনন্য দলিলচিত্র মুক্তির গান ছবিটির বড় অংশের চিত্রায়নও সেখানে হয়েছে। বিদেশি সাংবাদিকরা যখন বাংলাদেশের মুক্ত এলাকা দেখতে চাইতেন তাদের নিয়ে আসা হতো রৌমারী-রাজিবপুর। আর যদি দেখতে চাইতেন বাংলাদেশ সরকারের সচিবালয় তখন তাদের মুজিবনগরের আম্রকাননে নিয়ে যাওয়া হতো। কৌশলগত কারনে কলকাতায় বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রি পরিষদের সদস্যদের উপস্থিতির বিষয়টি এড়িয়ে চলতে হয়েছে। মুজিবনগরের আম্রকাননে ছিল পুরনো একটি দোতলা বাড়ি। বিদেশি সাংবাদিকদের যাবার আগে সেখানে একটি ব্যানার টাঙ্গিয়ে দেয়া হতো। অস্ত্র হাতে বারান্দায় দাঁড় করিয়ে রাখা হতো দু'জন মুক্তিসেনাকে। দূর থেকে সেটি দেখানো হতো বিদেশি সাংবাদিকদের। নিরাপত্তার কথা বলে তাদের ভবন পর্যন্ত যেতে দেয়া হতো না।

জিয়া-তাহেরের অনেককিছুর সাক্ষী প্রত্যক্ষদর্শী রৌমারীর মুক্তিযোদ্ধারা। তাদের অনেকে বলেছেন, যুদ্ধ কৌশল নিয়ে জিয়ার সঙ্গে প্রায়শ উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হতো তাহেরের। কৌশলী জিয়া সব সময় ছিলেন ধীরে চলার পক্ষে। ঝুঁকি নিয়ে বেশি এগিয়ে যাবার বিরোধী। আর শুধুই সামনে এগিয়ে যেতে চাইতেন কর্নেল তাহের। আগরতলার সাংবাদিকদের কাছে একাত্তরের ওই সময়টায় জিয়ার মিডিয়া প্রীতির নজির ছিল। তার রণাঙ্গনের খবর স্থানীয় সাংবাদিকদের কাছে নিয়ে আসতেন শাহাদাত চৌধুরী। খালেদ মোশাররফের ভূমিকা ছিল উল্টো। খালেদ মোশাররফের কে' ফোর্সের যুদ্ধের খবর স্থানীয় নানা গোয়েন্দা সূত্রে সাংবাদিকদের কাছে আসত। কিন্তু এসবের মিডিয়া কভারেজ নিয়ে তার কোন আগ্রহ দেখা যায়নি। আগরতলার সাংবাদিকদের কাছে জিয়া ব্যক্তি জীবনেরও একটি তথ্য ছিল। বেগম খালেদা জিয়াকে ঢাকা থেকে নিয়ে যেতে তখন মুক্তিযোদ্ধা হাবিবুর রহমান সানীকে ঢাকা পাঠানো হয়েছিল। মেজর জেনারেল নুরুল ইসলাম শিশুর ছোটভাই সানী। এরশাদের সামরিক শাসনের জমানায় জেনারেল শিশু গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ছিলেন। একাত্তরের ওই সময়ে বিপদজ্জনক লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে ঢাকায় খালেদা জিয়ার কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন সানী। কিন্তু বেগম জিয়া তার সঙ্গে যেতে রাজি হননি।

পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে জামালপুরের ধানুয়া কামালপুর এলাকায় তাহের গড়ে তুলেছিলেন তার এগার নম্বর সেক্টরের বিশেষ অঞ্চল। ধানুয়া কামালপুরে পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে একাধিকবার তাহের নেতৃত্বাধীন মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। অনেক মুক্তিযোদ্ধা শাহাদাত বরন করেছেন সে সব যুদ্ধে। এলাকার একজন মুক্তিযোদ্ধার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের কবরগুলো কোথায়। আশেপাশের বিস্তীর্ন এলাকার সব ফসলের মাঠ দেখিয়ে তিনি হয়ে পড়েন আবেগাক্রান্ত। বাস্পরুদ্ধ। ইশারায় শুধু বলতে পারেন এর সব জায়গাতেই কবর শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের। মুক্তিযোদ্ধাদের ইন্টারভ্যু করার নানা সময়ে এমন বিব্রত অবস্থায় পড়তে হয়েছে। শহীদ সহকর্মীদের কথা মনে করে অনেকে হাউমাউ কেঁদেছেন। নিজেকে সম্বরন করে প্রশ্ন রেখে বলেছেন, আজকের বাংলাদেশ এভাবে চলবে জানলে তাদের মরতে দিতাম না।

একাত্তরের সেপ্টেম্বরে কামালপুরের এক যুদ্ধেই গুরুতর আহত হন কর্নেল তাহের। ভারতীয় বাহিনীর হেলিকপ্টারে তাকে সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয় মেলাগড় হাসপাতালে । অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে বাদ দেয়া হয় তার একটি পা। ওই অবস্থাতেই মেলাগড় হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে আবার যুদ্ধে ফেরার স্বপ্ন দেখতে তাহের। কিন্তু তার আর যুদ্ধে ফেরা হয়নি। ধানুয়া কামালপুরে থাকতেই টাঙ্গাইল হয়ে ঢাকা পর্যন্ত পৌঁছবার একটি রুট পরিকল্পনা করেছিলেন তাহের। পরে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম দলটি সেই রুট ধরেই ঢাকা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে এই কর্নেল তাহেরকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করেছিলেন। রণাঙ্গনে তাহের আহত হবার পর উইং কমান্ডার হামিদউল্লাহ খানকে এগার নম্বর সেক্টরের দায়িত্ব দেয়া হয়। ইনিই এখন বিএনপি নেতা। সর্বশেষ মুক্তিযুদ্ধের শত্রু যুদ্ধাপরাধীদের দল জামায়াতে ইসলামীর কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে বিশেষ সম্মাননা।

সুবিদ আলী ভূঁইয়া তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে আসা জুনিয়র ক্যাপ্টেন। তার একটি পারিবারিক তথ্য আছে আগরতলায়। তার স্ত্রীর সন্তান হবে। কিন্তু তিনি ব্যস্ত রণাঙ্গনে। তাকে পাওয়া যাচ্ছিল না। সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্যের সেবিকা স্ত্রী গৌরী ভট্টাচার্য সহ আরও কয়েক মহিলা মিলে তার স্ত্রীর সন্তান প্রসবের ব্যবস্থা করেন। সন্তান জন্মের দশদিন পর আগরতলা ফিরে সুখবরটি পান ভুঁইয়া।

কলকাতার সাংবাদিকদের কাছে এমন আরেকটি চরিত্র ছিলেন মোহাম্মদ আলম।

দৈনিক ইত্তেফাকের ফটো সাংবাদিক। রণাঙ্গনে আর শরণার্থী শিবিরগুলোতে ঘুরে ঘুরে ছবি তুলতেন। নানা কারনে ওই সময়ে মোহাম্মদ আলম হয়ে উঠেছিলেন মুক্তিকামী বাঙ্গালি তারুণ্যের শৌর্যের প্রতীক। মাঝে মাঝেই শহর থেকে অজানার পথে উধাও হয়ে যান। আবার ফিরে এসে সবাইকে মাতিয়ে তোলেন। এমন একবার বেশ কিছুদিন বিরতির পর দেখা গেল কলকাতার রাস্তায় একটি জীপ গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন মোহাম্মদ আলম। গাড়িটা পেলেন কোথায়? প্রশ্ন করলে জবাব দেন, বুঝেন না সব ফ্রি। এখানে জয় বাংলা বললে সব ফ্রি। জোরে এক জায়গায় জয় বাংলা বললাম। এক ভদ্রলোক তখন তার গাড়িটা দিয়ে বললেন, এটি আপনার কাছে রাখুন। আপনার কাজে সুবিধা হবে। আগরতলার সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্যের মতো কলকাতার একজন সাংবাদিক যুদ্ধকালে নানা কারনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন। ইনি রনেন মুখার্জি। কীর্ত্তিবাস ওঝা নামে লিখতেন। পাকিস্তানি বাহিনীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পৌঁছেন ঢাকায়। বেগম মুজিব, দুই মেয়ে শেখ হাসিনা, রেহানা সহ পাকিস্তানের গৃহবন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে সবে এসে পৌঁছেন ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়িতে। বাঙ্গালির জাতীয় যুদ্ধের নেতার সদ্য মুক্ত পরিবারের যখন ছবি তুলছিলেন তখন বাড়িতে একটি ফোন আসে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ফোন। পরাজিত পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তির পরপর দেশের পরিবারের সদস্যদের খবর নিতে ফোন করেছেন বঙ্গবন্ধু। টেলিফোন ধরে বেগম মুজিবের জবাবে চমকে যান রনেন মুখার্জি। যাকে তার একজন সাধারন গৃহবধূ মনে হয়েছে তিনি শেখ মুজিবকে পরামর্শ দিচ্ছেন তিনি যাতে সরাসরি দিল্লী হয়ে ঢাকা না ফেরেন। সরাসরি দিল্লী হয়ে ফিরলে ভারতপন্থী হিসাবে তার ইমেজ-বদনাম হতে পারে। এরপর বঙ্গবন্ধুর দেশে ফেরার রুট সৃষ্টি করা হয় ইসলামাবাদ-লন্ডন-দিল্লী-ঢাকা। নব্বুই দশকে দেখা রনেন মুখার্জির নৈহাটির বাড়ি বোঝাই করা ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নানা স্মৃতি। অনিল ভট্টাচার্য এখন বেঁচে নেই। রনেন মুখার্জির অবস্থা জানা হয়নি অনেকদিন।

শেষ.

বাংলাদেশ ঘুরে বেড়াবার সময় দেশের নানা এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি স্থানীয় রাজাকারদের তালিকা সংগ্রহ, তাদের ইন্টারভ্যু করার চেষ্টা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের পরপর এলাকায় এলাকায় স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্যোগে এলাকার স্বাধীনতা বিরোধী যুদ্ধাপরাধী রাজাকারদের তালিকা তৈরি হয়। মুন্সিগঞ্জ জেলায় তৈরি এমন একটি টাইপ

করা তালিকা একজন মুক্তিযোদ্ধার মাধ্যমে হাতে আসে। জিয়া-এরশাদ আমলে রাজনৈতিক পুনর্বাসনের সুযোগে এলাকাগুলোর স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকাররা ততক্ষনে আবার শক্তিশালী অবস্থা নিতে শুরু করেন। এমন একজন জয়পুরহাটের আব্দুল আলীমকে মুক্তিযোদ্ধারা ধরে দিয়ে এসেছিল থানায়। ওই সময়ে থানায় বন্দী রাখার লকআপ বলতে ছিল লোহার পিঞ্জিরা। এমন একটি লোহার পিঞ্জিরায় বন্দী একাত্তরে নিষ্ঠুরতার জন্যে জয়পুরহাট এলাকায় বিশেষ পরিচিত আব্দুল আলীমের ছবিও ছাপা হয়েছিল জাতীয় পত্রপত্রিকায়। সামরিক শাসকদের রাজনৈতিক খায়েশের সুযোগে এমন একজন আব্দুল আলীম মন্ত্রীও পরে হতে পেরেছেন। ময়মনসিংহ এলাকার তেমন নিষ্ঠুর রাজাকার বলে পরিচিতি ছিলেন আজকের জামায়াতে ইসলামীর নেতা কামারুজ্জামান, ফুলপুরের রজব আলী সহ আরও অনেকে। রজব আলীকে এরশাদ আমলে উপজেলা চেয়ারম্যান করা হয়। সারা বাংলাদেশ জুড়েই আছে এমন আরও অনেক দৃষ্টান্ত। ভোলার রাজাকার মোখলেসুর রহমান বললেন, যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনী হেরে যাচ্ছে দেখে তিনি স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা তার এক ভাগ্নের কাছে চলে যান। সেখানে গিয়ে দেখেন তার মতো আরও অনেকে আশ্রয়ের প্রাণ বাঁচানোর আশায় সেখানে গিয়ে উঠেছেন। ভাগ্নে তাকে বলল মামারে আপনারে এখানে রেখে বাঁচানোর পথ দেখি না। এরচেয়ে বরং আপনাকে নিয়ে জেলখানায় রেখে আসি। সেখানে অন্তত নিরাপদে থাকবেন। এরপর মোখলেসুর রহমান সহ অন্য রাজাকারদের নিয়ে ভোলা সদর থানার মাধ্যমে নিয়ে যাওয়া হয় জেলখানায়। মোখলেসুর রহমান বললেন, জেলখানায় ভালোই আছিলাম। নিরাপদে থাকছি, খাইছি আর আর আল্লারে ডাকছি। একদিন শেখ সাহেব মাপ করে দিলেন, বেরিয়ে এলাম। শেখ সাহেব যে আপনাকে মাপ করে দিয়েছিলেন, এ সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি? এ প্রশ্নে বিস্ফোরিত হন রাজাকার মোখলেসুর রহমান...মাপ করব না মানে? আমাদের গায়ে হাত দেয় এ্যামন ক্ষমতা শেখের বেটার আছিলোনি! এভাবেই আজকের পথে এসেছে বাংলাদেশ।

fazlulbari@y7mail.com